প্রথম পাতার পর

ব্রিটিশ বাংলাদেশীর দায়

পাঠানোরও পরিকল্পনা করে।

ডেইলি মেইল জানায়, এদের মধ্যে লন্ডনের বাসিন্দা মোহাম্মদ চৌধুরী (২১) ও শাহ রহমান (২৮) বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত।

পুলিশ বলছে, অভিযুক্তরা মুম্বাইয়ে চালানো সন্ত্রাসী হামলার অনুকরণে লন্ডনেও কীভাবে হামলা চালানো যায় তা নিয়ে কথাবার্তা বলছিল। এদের একজনের বাড়িতে লন্ডনের মেয়র বরিস জনসন, লন্ডনে মার্কিন দূতাবাস এবং দুজন ইহুদি ঋবাই-এর ঠিকানা পাওয়া যায়।

তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের দায় স্বীকার করে চার অভিযুক্ত বলেছে, মুসলিম জঙ্গি নেতা আনওয়ার আল-আওলাকির কথায় তারা প্ররোচিত হয়েছিল। আনওয়ার আল-আওলাকি গত বছর ইয়েমেনে এক হামলায় নিহত হন।

২৫ অবৈধ বাংলাদেশীকে

করছিলেন। বিপুল সংখ্যক এই বাংলাদেশীকে এখন স্বদেশে ফেরত পাঠানোর তোড় জোড় চলছে। যেসব প্রতিষ্ঠানে এসব বাংলাদেশীরা কাজ করছিলেন, সেসব প্রতিষ্ঠানসমূহ যুক্তরাজ্যের আইন অনুসারে ১০ হাজার পাউন্ড পর্যন্ত আর্থিক দন্ডের শিকার হবে।

ইউকেবিএ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, 'আমরা অবৈধভাবে ব্রিটেনে কাউকে কাজ করতে দেবোনা। এ বিষয়ে ব্রিটিশ সরকার এখন আগের চাইতে অনেক কঠোর।'

ইউকেবিএ আরো জানায়, কর্মীদের নিয়োগ করার ক্ষেত্রে মালিকরা যাতে সহজে তাদের ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস সম্পর্কে খোঁজ নিতে পারেন সেজন্য ইউকেবিএ সবসময়েই সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

বিশ্বের একনম্বর ঝুঁকিপূর্ণ

কাহিনী দিয়ে শুরু প্রতিবেদনে বলা হয়, যখন দেখা গেল বাংলাদেশে যে টাকা পাঠানো হচ্ছে, তা দুই-তিন মাসের মধ্যেই দ্বিগুণ, এমনকি তিন গুণ হয়ে যাচ্ছে তখন হাফিজুর রহমানের পরিবারের কেউই এ নিয়ে আর বেশি প্রশ্ন তোলেননি। তার দুলাভাই মির্জা গোলাম সবুর বলেন, 'তিনি ছিলেন রাজপুত্রের মতো।' তাই যখন সবুর গত মে মাসে জানতে পারেন, তার ৫৫ বছরের শ্যালক হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন, তিনি খুবই মর্মাহত হন। আরও মর্মন্তুদ ব্যাপার ছিল, হাফিজুরের নামে তার আত্মীয়রা ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা থেকে যে হাজার হাজার ডলার পাঠিয়েছিলেন তার একটা বড় অংশই উধাও হয়ে গেছে। এই তহবিল দিয়ে তারা বন্দরনগরী খুলনায় আত্মীয়দের অবসর যাপনের জন্য বাড়ি তৈরি করতে চেয়েছিলেন। বাংলদেশের অস্থির শেয়ার মার্কেটে তাদের সেই টাকা হাওয়া হয়ে যায়।

টাইম বলছে, হাফিজুর রহমানের মতো এমন করুণ কাহিনী গোটা বাংলাদেশে বহুগুণে বেড়ে যাচ্ছে। দেশের প্রধান শেয়ার মার্কেটের সূচক ২০১১ সালের প্রথম থেকে ৫৫% কমে গেছে। পতনের এই ধারা অব্যাহত আছে। যদিও বাংলাদেশের ৫৮ বছরের শেয়ার মার্কেটের ইতিহাসে এমন উত্থান-পতন হয়েছে, তবে ১২ মাস ধরে এমন খাড়া পতনের কারণে লাখ লাখ ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দীর্ঘ সংঘাতের দেশটি অবশেষে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়াচ্ছিল। কিন্তু শেয়ার মার্কেটের এ অবস্থার ফলে দেশে নতুন করে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক হাঙ্গামা দেখা দিতে পারে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশের দ্রুত বিকাশমান পোশাক শিল্পের কারণে ২০০৬ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ৬.৩%। ২০০৫ সালে (চারদলীয় জোটের সময়) গোল্ডম্যান স্যাক্স বাংলাদেশকে দ্রুত উদীয়মান অর্থনীতির পরবর্তী ১১টি দেশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে। ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত ও চীনের পরই এ তালিকায় ছিল বাংলাদেশ। বেপরোয়া ব্যাংক বিনিয়োগ ও বিনিয়োগকারীদের দ্রুত অর্থপ্রবাহ আজকের বাজারের এই নাটকীয় উত্থান এবং দ্রুতগতির পতনের জন্য দায়ী হলেও বিনিয়োগকারীদের জন্য এটি একটি সতর্ক সংকেত যে, তারা বিপদে পড়তে পারে।

টাইম বলছে, পোশাক শিল্পের কারণে দেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি হচ্ছিল। এখানে ২৫ লাখ গার্মেন্টকর্মী মাসজুড়ে কাজ করে মাত্র ৪০ ডলার বেতন পায়। এটা দক্ষিণ চীনের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। কম মজুরির কারণে বাংলাদেশ বিশ্বে পোশাক বাজারের কেন্দ্রে পরিণত হয়। বাংলাদেশে বিনিয়োগকারী স্টকহোম-ভিত্তিক ব্রুমার অ্যান্ড পার্টনাসস্রের হিসাবমতে, ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ পোশাক রফতানি করে আয় করত ২০০ কোটি ডলারেরও কম। ২০১১ সালে পোশাক রফতানি করে বাংলাদেশ আয় করে ১৭৯০ কোটি ডলার। বাংলাদেশ থেকে পোলো শার্ট ও ব্লু জিন্স রফতানি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গত বছর মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং গ্রেট ব্রিটেনে কর্মরত প্রবাসী ৫০ লাখ বাংলাদেশী নির্মাণ শ্রমিক, নাবিক ও রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ী ১০ হাজার কোটি ডলারের অর্থনীতির বাংলাদেশে নগদ অর্থে ১২০০ কোটি ডলার পাঠিয়েছে। পোশাক রফতানির পাশাপাশি প্রবাসীদের পাঠানো এই বিপুল অর্থ বাংলাদেশের তিন ডজনের বেশি ব্যাংকে জমা হয়েছে। এসব ব্যাংকের অনেকগুলোই নতুন লাইসেন্স পেয়েছে। এগুলো ছোট আকারের, ব্যবস্থাপনায় পেশাদারিত্ব নেই। যেহেতু মূল্যস্ফীতি বাড়ছিল এবং অনেক ব্যাংক আমানতকারীদের অর্থে বেশি মুনাফা করার জন্য শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগ করে, তাই ব্যাংকগুলোও শেয়ার মার্কেটের খেলোয়াড়ে পরিণত হয়। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদের মোট দায়ের করা ১০ ভাগ শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগ করার অনুমতি দেয়। ঢাকার বিনিয়োগ ফার্ম এটি ক্যাপিটালের ম্যানেজিং পার্টনার ইফতি ইসলাম বলেন, এটা ছিল আন্তর্জাতিক যে রীতিনীতি আছে তার চেয়ে খুবই কম নিয়ন্ত্রণমূলক।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ব্যাংকগুলো শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগ করার কারণে মার্কেট রকেট গতিতে বাড়তে থাকে। ২০১০ সালে দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ৯০% বেড়ে যায়। এতে স্বল্প সময়ের প্লেয়াররা বিনিয়োগে প্রলুব্ধ হয়; এমনকি যারা শেয়ার মার্কেট সম্পর্কে তেমন কিছু জানে না, তারাও বিনিয়োগ করতে থাকে। ইফতি ইসলামের মতে, শেয়ার মার্কেটে ২০০৭ সালের ৫ লাখ বিনিয়োগকারীর বিপরীতে ২০১০ সালে বিনিয়োগকারীর সংখ্যা ৭ গুণ বেড়ে ৩৫ লাখে উন্নীত হয়। সবুর বলেন, অনেক লোকেরই কোনো বিনিয়োগ জ্ঞান ছিল না, কিন্তু মার্কেট এত ফুলে-ফেঁপে ওঠে যে, সবাই শেয়ার কিনতে থাকে।

স্বাভাবিকভাবেই এই বুদবুদ ফেটে যায়। ২০১০ সালের শেষ নাগাদ মূল্যস্ফীতি ১১ শতাংশ বেড়ে যাওয়ায় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়। এ সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফের ব্যাংকগুলোর ওপর বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করে। ফলে ২০১০ সালের পুরোটা সময় ধরে শেয়ার মার্কেটের যে উন্নতি হয়েছিল তার সমূলে পতন হয়। এটা এখন মারাত্মক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি করছে। ইউরোপে পোশাকের চাহিদা কমে যাওয়া এবং বিদেশে বাংলাদেশীদের কাজের সুযোগ তেমন না বাড়ায় বর্তমানে দেশ চলতি হিসেবের ঘাটতিতে রয়েছে। ফলে গত দুই বছরে বাংলাদেশের টাকার মান ২০ শতাংশ কমে গেছে। এতে মার্কেট আরও পিচ্ছিল হয়েছে। সিঙ্গাপুর ভিত্তিক এইচএসবিসি প্রাইভেট ব্যাংকের বিনিয়োগ কৌশলের প্রধান অরজুনা মাহেন্দ্র বাংলাদেশের শেয়ার মার্কেট সম্পর্কে বলেন, একটু ভালো করার আগেই অবস্থার আরও অবনতি হচ্ছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, খাদ্যের উচ্চমূল্যের কারণে শেখ হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে গণ-অসন্তোষ বাড়ছে। গত বছর পুরো সময় ধরে একদল বিক্ষুব্ধ বিনিয়োগকারী ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান কার্যালয়ের সামনে নিয়মিত বিক্ষোভ করেছে। তারা টায়ারে আগুন দিয়ে প্রতিবাদ করেছে। হতাশ এসব বিনিয়োগকারীর অভিযোগ, সরকার গুজব কমিয়ে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নেয়নি। গত এপ্রিলে বিশিষ্ট ব্যাংকার খোন্দকার ইব্রাহীম খালেদের নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটি প্রতিবেদন দেয় যে, ২০১১-এর জানুয়ারিতে শেয়ার মার্কেটের ধসের আগে বড় ধরনের কারসাজি হয়েছে। এর ফলে ২০১৩ সালের সাধারণ নির্বাচন নিয়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে ট্রানজিটের অবকাঠামো নির্মাণে চীনকে প্রস্তাব

পরীক্ষামূলক ট্রানজিট অব্যাহত রাখার দাবি ভারতের

ট্রানজিট উপযোগী অবকাঠামো নির্মাণে ভারত নয়, চীনা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়নের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। এ প্রস্তাব রেখেছে সড়ক ও জনপথ অধিদফতর (সওজ)। ভারত সরকারের ১০০ কোটি ডলার ঋণের জটিল শর্তের কারণে এসব প্রকল্প চূড়ান্তপর্যায়ে বাতিল করা হচ্ছে। বাংলাদেশ-ভারত যৌথ ইশতেহার অনুযায়ী অবকাঠামো নির্মাণের জন্য সম্ভিক খাতে নেয়া সব প্রকল্প বাতিল করার প্রস্তাব রেখেছে সড়ক ও জনপথ অধিদফতর। সওজের প্রস্তাবে সড়ক খাতে নেয়া প্রকল্পগুলো কারিগরি দৃষ্টিকোণ থেকে বাস-বসম্মত নয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রকল্পগুলো ভারতের বদলে অন্য কোনো দাতা সংস্থার অর্থে বা সম্পূর্ণ দেশীয় অর্থে বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হয়েছে। পাশাপাশি এসব প্রকল্পের পরিবর্তে সড়ক-মহাসড়ক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কিনতে বলা হয়েছে। সওজের অধীন সড়কগুলোতে যানবাহন চলাচল নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন রাখতে সড়ক-মহাসড়কের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ট্রাক, মোবাইল অ্যাসফল্ট প্ল্যান্ট ও রোলার নেই উল্লেখ করে এ ধরনের যন্ত্রপাতি কেনার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

সড়ক ছাড়াও রেলওয়ের জন্য নেয়া তিন প্রকল্পও বাতিল হতে যাচ্ছে বলে সড়ক ও রেল বিভাগের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। তারা জানান, ভারতীয় ঋণের আওতায় নেয়া সড়ক অবকাঠামো নির্মাণের চার প্রকল্প বাদ দিয়ে শুধু যন্ত্রপাতি কেনার দুই প্রকল্পের প্রস্তাব রেখেছে সওজ। যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে ইতোমধ্যে এ প্রস্তাবসংবলিত চিঠি দিয়েছে সওজ। এ ছাড়া রেলের তিন প্রকল্পের মধ্যে দুটো চীনা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস-বায়নের প্রস্তাব দিয়েছে রেল বিভাগ। অন্য দিকে অবকাঠামো সুবিধা না থাকলেও পণ্য পরিবহন সুবিধা দেয়ার ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক ট্রানজিট দেয়া অব্যাহত রাখার দাবি জানিয়েছে ভারত।

ভারতের ১০০ কোটি ডলার ঋণের আওতায় যোগাযোগ খাতে ১৮টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে সড়ক ও জনপথ অধিদফতরের আওতায় চারটি প্রকল্প। এর মধ্যে রয়েছে বারৈয়ারহাট-হেঁয়াকো-রামগড়-সাবরুম স্থলবন্দর সংযোগ সড়ক। এতে ব্যয় ধরা হয় ২০৩ কোটি টাকা। বাংলাদেশ-ভারত যৌথ ইশতেহারে ভারতের সাবরুমের সাথে বাংলাদেশের রামগড় স্থলবন্দর সক্রিয় করার কথা বলা হয়েছে। এ স্থলবন্দর সক্রিয় করতে হলে যোগাযোগ অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। এ অবকাঠামো গড়তেই এসব প্রকল্প নেয়া হয়।

যৌথ ইশতেহারের লক্ষ্য বাস-বায়ন সামনে রেখে সরাইল-ব্রাহ্মণবাড়িয়া-সুলতানপুর-চিনাইর-আখাউড়া-সেনারবাদি স্থলবন্দর সড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীত করতে ২৩৩ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প নেয়া হয়। অবকাঠামো নির্মাণের জন্য লালমনিরহাট-বুড়িমারী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যয় ধরা হয় ৫৫৮ কোটি টাকা। এ ছাড়া রাজধানীর জুরাইন রেল ক্রসিংয়ে একটি ওভারপাস নির্মাণের জন্য ৬৮ কোটি টাকার প্রকল্প নেয়া হয়।

অবকাঠামো সুবিধা না থাকলেও পণ্য পরিবহন সুবিধা দেয়ার ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক ট্রানজিট প্রদান অব্যাহত রাখার দাবি জানিয়েছে ভারত। আশুগঞ্জ ও শেরপুর বন্দরে এ অবকাঠামোগত সুবিধা এখনো সৃষ্টি হয়নি বলে জানিয়েছেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা। এ প্রসঙ্গে তারা জানান, ভারতের সাথে বিদ্যমান প্রটোকলে আশুগঞ্জ থেকে সড়কপথে আখাউড়া এবং শেরপুর থেকে সুতারকান্দি পর্যন্ত ট্রাকযোগে পণ্য পরিবহনে কোনো বাধা না থাকলেও কখনোই সুতারকান্দি রাস-য় ভারতীয় পণ্যবাহী ভারী যানবাহন চলাচল করেনি। বিশেষ করে সুতারকান্দি পর্যন-ট্রাকযোগে পণ্য পরিবহনের প্রয়োজনীয় সড়ক অবকাঠামো নেই। এ তথ্য জানিয়ে নৌ মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, অবকাঠামো সুবিধা সৃষ্টি না করে ভারতকে এভাবে ট্রানশিপমেন্ট সুবিধা দেয়া অব্যাহত থাকলে বন্দর এবং সড়কের ব্যাপক ক্ষতি হবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) পক্ষ থেকে নৌমন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে, নৌ প্রটোকল চুক্তি অনুসারে আশুগঞ্জ বা শেরপুর থেকে সুতারকান্দি পর্যন-ভারতীয় পণ্য পরিবহনে কোনো বাধা নেই। তবে দেখতে হবে ট্রানশিপমেন্ট উপযোগী অবকাঠামো রয়েছে কি না। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, এনবিআরের পক্ষ থেকে অবকাঠামো সুবিধার বিষয়ে জানতে চাওয়া চিঠির জবাবে বিআইডব্লিউটিএ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নেই বলে জানিয়ে দিয়েছে।

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ২০১০ সালের ৭ আগস্ট ভারতীয় ১০০ কোটি ডলার ঋণের চুক্তি হয়। ওই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে ভারতের এক্সিম ব্যাংক ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, ভারতীয় ঋণের আওতায় নেয়া প্রকল্পগুলোর ৮৫ শতাংশ পণ্য কিনতে হবে ভারত থেকেই। ভারতীয় সরবরাহকারীরাই এসব পণ্য সরবরাহ করবে। তবে সরবরাহকারী প্রয়োজন মনে করলে ১৫ শতাংশ পণ্য ভারত ছাড়া অন্য যেকোনো দেশ থেকে কিনতে পারবে। অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পে ব্যবহারের জন্য মাটি, ইট ও সিমেন্টসহ বিভিন্ন সাগ্রীর সংগ্রহ স্থান সম্পর্কে চুক্তিতে স্পষ্টভাবে কিছুই বলা হয়নি। দরপত্র আহ্বান ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। ভারতে নিবন্ধিত ও কমপক্ষে ভারতের ৫১ শতাংশ মালিকানাধীন কোম্পানি দরপত্রে অংশ নিতে পারবে। দরপত্র আহ্বানকারীরা নিজস্ব পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করে সরবরাহকারীর (ঠিকাদার) সাথে চুক্তি করবে।

ভারতীয় ১০০ কোটি ডলার ঋণের আওতায় রেলের ১২টি প্রকল্প রয়েছে। মিটারগেজ লাইনে চলাচলকারী ট্রেনগুলোর জন্য পৃথকভাবে নেয়া ১৫০টি ও ১২৬টি যাত্রীবাহী কোচ এবং ১০ সেট ডিইএমইউ ক্রয় প্রকল্পের জন্য ইতোমধ্যে দুইবার দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। ভারতের কোনো প্রতিষ্ঠান এতে অংশ নেয়নি। এ তিন প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ১৫৭৫ কোটি টাকা। ঋণের শর্ত অনুযায়ী, সড়কের মতোই ভারতীয় ঋণের আওতায় নেয়া প্রকল্পগুলোর ৮৫ শতাংশ পণ্য কিনতে হবে ভারত থেকে। এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ রেলওয়ে যাত্রীবাহী কোচগুলো ভারতীয় কোম্পানির কাছ থেকে সংগ্রহ না করে চীনের কোনো কোম্পানি থেকে প্রস্তাব রেখেছে।

ভারতীয় ঋণে সওজের চার প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে ইতোমধ্যে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও সওজের মধ্যে কয়েক দফা বৈঠক হয়েছে। বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কেও অবহিত করা হয় বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। শেষপর্যায়ে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে ভারতীয় পক্ষের সম্মতির জন্য অপেক্ষা করছিল মন্ত্রণালয়। এ পরিস্থিতির মধ্যেই গত ৯ জানুয়ারি সওজ প্রকল্প পরিবর্তনের প্রস্তাব দিয়েছে। ঋণচুক্তির জটিলতার কারণে ভারতীয় এসব প্রকল্প বাস-বায়ন করা যাবে না বলে সওজের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। সওজের এ প্রস্তাব খতিয়ে দেখতে মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিবকে (উন্নয়ন) প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

একুশের বইমেলায় অনুমতি

কোন স্টল করার। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে এসব করা হলেও অন্যান্য ধর্মাবলী গ্রন্থের প্রবেশ নিষেধ করা হয়নি।

এদিকে মহান ভাষা দিবসে বাংলা একাডেমীতে যে বই মেলা হচ্ছে তাতে ইসলামী বই-পুস্তকের কোনো লাইব্রেরি রাখতে অনুমতি না পাওয়ায় তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ইসলামী ও সমমনা ১২ দলের নেতারা।

গতকাল ইসলামী ও সমমনা ১২ দলের কেন্দ্রীয় কমিটির এক বৈঠকে বক্তারা এসব কথা বলেন। এতে সভাপতির বক্তব্যে সংগঠনের আহ্বায়ক মাওলানা মুহিউদ্দিন খান বলেন, সংবিধানের মূলনীতি থেকে আল্লাহর ওপর আস্থা ও বিশ্বাস বাদ দেয়া, বিসমিল্লাহর বিকৃত অর্থ করা, কোরআনবিরোধী নারী নীতিমালা, ধর্মহীন শিক্ষানীতি চালু, মসজিদগুলোকে বিধর্মীদের ভাগ করে দেয়ার ষড়যন্ত্রসহ ইসলাম নির্মূলের জন্য সরকার ও সরকারের ছত্রছায়ায় নানামুখী ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। দেশ থেকে ইসলাম বিদায়ের জন্য দেশি-বিদেশি বামগোষ্ঠী ও নাস্তিক-মুরতাদরা সরকারের ছত্রছায়ায় আজ বেসামাল হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, সরকারের কাছে আমাদের কোনো ব্যক্তি বা দলের এজেন্ডার বাস্তবায়নের জন্য আল্টিমেটাম দেইনি। আমরা আমাদের জাতিসত্তা, ইসলামী আকিদা সংরক্ষণের জন্যই দাবি করে আসছি। বর্তমানে সংসদ চললেও এসব দাবির পক্ষে আজ পর্যন্ত কোনো বিল আনছে না। আমরা আশা করি, সরকার এ মাসের মধ্যে বিল এনে তা পাস করার ব্যবস্থা করবে। অন্যথায় কঠোর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে, যার দায়-দায়িত্ব সরকারকেই বহন করতে হবে।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা আব্দুর রব ইউসুফী, অধ্যক্ষ মাওলানা যাইনুল আবেদীন, অ্যাডভোকেট আব্দুল মোবিন, মমতাজ চৌধুরী, মাওলানা জাফরুল্লাহ খান, আলমগীর মজুমদার, ড. মাওলানা খলিলুর রহমান মাদানী, এম.এ. রশিদ প্রধান, মাওলানা শফিকুর রহমার প্রমুখ।